মানব সৃষ্টির বিস্ময়কর ঘটনা

যে চলচ্চিত্রটি আপনি দেখতে যাচ্ছেন, তা ব্যাখ্যা করছে কিভাবে মানব সৃষ্টি হয়েছে, এবং অস্তিত্ব পাওয়ার জন্য তাকে কোন কোন ধাপের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে।

এই চলচ্চিত্রটি আপনার সম্পর্কেই।

চলুন, আমরা সময়ের অভ্যন্তরে একটি সংক্ষিপ্ত সফর করি এবং অতীতে চলে যাই। প্রত্যক্ষ করি একটি অসাধারণ কাহিনী, নানা বিস্ময়কর ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ।

দেখি, মানুষ একসময় কি ছিল।

মায়ের গর্ভে একটি একক কোষ। একটি অসহায় বস্তু যার নিরাপত্তার প্রয়োজন। একদানা লবণের চেয়েও ক্ষুদ্রতর। আপনিও একসময় এই একক কোষ দিয়ে গঠিত হয়েছিলেন। বিশ্বের আর সকলের মতই।

তারপর এই কোষটি ভেঙে দুটি কোষ তৈরী হলো। তারপর আবারও তারা বিভাজিত হয়ে চারটি কোষ হলো। তারপর আটটি, তারপর ষোলটি।

কোষের বিভাজন চলতেই থাকলো। প্রথমে তৈরি হলো এক টুকরো মাংস। তারপর এই মাংসপিণ্ডটি একটি আকৃতি নিল। এর বাহু, পা ও চোখ তৈরী হলো। আদি কোষের তুলনায় এটি বেড়ে ১০০ বিলিয়ন গুণ বড় হলো এবং ৬ বিলিয়ন গুণ ভারী হলো।

এভাবে আল্লাহ বিস্ময়ের পর বিস্ময় সংঘটিত করলেন এবং তৈরী করলেন মানুষ, যা আপনি চলচ্চিত্রে দেখছেন, যে মানুষ একসময় ছিল একফোঁটা পানি মাত্র। এবং তিনি কুরআনে জানালেন কিভাবে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন:

"মানুষ কি মনে করে যে তাকে অনিয়ন্ত্রিত (উদ্দেশ্যবিহীন) ভাবে ছেড়ে দেওয়া হবে? সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না? অতঃপর সে ছিল

রক্তপিণ্ড, তারপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন এবং তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল—নর ও নারী। তবুও কি সেই আল্লাহ মৃতদের জীবিত করতে সক্ষম নন?" (সূরা আল-কিয়ামাহ : ৩৬-৪০)

ডিম্বকোষের সফর

দৈনন্দিন জীবনের জালে জড়িয়ে অধিকাংশ সময়ই আমরা আমাদের চোখের সামনে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিস্ময় সম্পর্কে অনবহিত থেকে যাচ্ছি। এটি হচ্ছে মানব সৃষ্টির বিস্ময়কর ঘটনা।

সৃষ্টির প্রথম আশ্চর্য ঘটনার শুরু হচ্ছে একজন স্ত্রীলোকের দেহে, ডিম্বাশয় নামক অঙ্গে, যেখানে একটি একক ডিম্বকোষ পরিপূর্ণতা লাভ করছে...

এই ডিম্বকোষের সামনে রয়েছে লম্বা সফর। প্রথমেই এটি প্রবেশ করবে ডিম্বনালীতে, তারপর সেখানে লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করে অবশেষে পৌঁছাবে মায়ের গর্ভে।

ডিম্বাশয় থেকে পরিপূর্ণ ডিম্বকোষ বের হওয়ার পূর্বেই ডিম্বনালী সেটিকে ধরার জন্য তৈরী হয়। সূক্ষ্ম নড়াচড়ার সাহায্যে এটি ডিম্বাশয়ের উপর থেকে ডিম্বকোষটির অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করে। অনুসন্ধান করে ডিম্বনালী ডিম্বকোষটিকে খুঁজে বের করে এবং নিজের ভিতর টেনে নেয়।

অবশেষে শুরু হয় ডিম্বকোষের সফর।

সম্পূর্ণ ডিম্বনালীটি সে অতিক্রম করে, কিন্তু এ কাজের জন্য তার কোন প্রত্যঙ্গ নেই, কোন পাখা অথবা পা। একটি বিশেষ পদ্ধতির সৃষ্টি করা হয়েছে এ কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য।

ডিম্বনালীর ভেতরের লক্ষ লক্ষ কোষকে বিদ্যুতায়িত করার ব্যবস্থা রয়েছে যাতে ডিম্বকোষটি নিশ্চিতভাবে গর্ভে প্রবেশ করতে পারে।
এই কোষগুলো তাদের উপরের স্তরে সিলিয়া নামক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চুলগুলোকে এমনভাবে স্থাপন করে যেন তারা গর্ভের দিকে মুখ করে থাকে।
এভাবে তারা ডিম্বকোষকে সঠিক দিকে পাঠায়, যেন একটি অতি মূল্যবান বস্তু এক হাত থেকে অপর হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।
এক মুহূর্তের জন্য ভাবুন ঘটনাটি। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চুলগুলো একটি বুদ্ধিমান পরিকল্পনার অংশ, যারা সঠিক স্থানে অবস্থান করছে যেখানে তাদের প্রয়োজন হবে, সঠিক আকৃতি ধারণ করে। একত্রে তারা একটি বিশেষ দিকে একটি বহনকারী গতি সৃষ্টি করছে।
যদি এই কোষগুলোর একটি অংশ তাদের কাজ যথাযথ ভাবে সম্পাদন না করে, বা অন্য কোন দিকে করে, তাহলে ডিম্বকোষটি তার গন্তব্যে পৌঁছাবে না, এবং জন্ম সম্ভব হবে না।
কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টি নিখুঁত এবং প্রতিটি কোষ নির্ভুলভাবে তার কাজ সম্পন্ন করে।
এভাবে ডিম্বকোষটি তার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত স্থান, অর্থাৎ মায়ের গর্ভে উপনীত হয়।
কিন্তু এত সতর্কতার সাথে বহন করা ডিম্বকোষটির আয়ু মাত্র ২৪ ঘণ্টা। এই সময়ের মধ্যে গর্ভাধান না হলে, এর মৃত্যু ঘটবে।
গর্ভাধানের জন্য এর প্রয়োজন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু।
পুরুষের দেহ নিঃসৃত শুক্রাণু।

শুক্রাণুর গঠন

শুক্রাণু একটি কোষ যার কাজ হচ্ছে নারীদেহের ডিম্বাণুকে পুরুষের জেনেটিক উপাত্ত প্রদান করা। ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলে বোঝা যায়, শুক্রাণুর চেহারা এ কাজের উপযোগী করে বিশেষভাবে নির্মিত কোন যন্ত্রের মত। শুক্রাণুর সামনের অংশ বর্মসজ্জিত। প্রথম বর্মের ভিতরে আরেকস্তর বর্ম রয়েছে, এবং এই দ্বিতীয় স্তরের নীচে রয়েছে শুক্রাণু কর্তৃক বহন করা মালপত্র।

এই মালপত্র হচ্ছে পুরুষের ২৩টি ক্রোমোজম। এই ক্রোমোজমগুলোর ভেতরে মানবদেহ সম্পকে খুঁটিনাটি সমস্ত তথ্য রয়েছে।

নতুন একটি মানুষর জন্মের জন্য শুক্রাণুর এই ২৩টি ক্রোমোজমের সাথে মায়ের দেহের ডিম্বাণুর ২৩টি ক্রোমোজম একত্রিত হওয়া দরকার। এভাবে এক ব্যক্তির ৪৬টি ক্রোমোজমের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

শুক্রাণুর বর্ম তার যাত্রাপথে তাকে সমস্ত বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে যাতে এই মূল্যবান মালপত্র যথাস্থানে পৌঁছাতে পারে।

কিন্তু শুক্রাণুর গঠন কেবল এটুকুই নয়। এর মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে একটি ইঞ্জিন, যার শেষাংশ শুক্রাণুর লেজের সাথে যুক্ত।

ইঞ্জিনের শক্তি লেজটিকে প্রপেলারের মত ঘোরায়, যাতে শুক্রাণু দ্রুত চলাচল করতে পারে।

যেহেতু মাঝামাঝি জায়গায় ইঞ্জিন রয়েছে, চলতে হলে এর জ্বালানীরও প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ইঞ্জিনের সবচেয়ে কার্যকর জ্বালানী, ফ্রুকটোজ, রাখা হয়েছে শুক্রাণুকে ঘিরে থাকা তরলের মধ্যে।

এভাবে সারা যাত্রাপথের জ্বালানী সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

এই নিখুঁত গঠনের কারণে শুক্রাণু দ্রুত ছুটে চলে ডিম্বাণুর দিকে। শুক্রাণুর দৈর্ঘ্য এবং এর যাত্রাপথের দূরত্ব হিসাব করে দেখা যায় যে এটি একটি স্পীডবোটের মত গতিতে চলে।

এই বিস্ময়কর ইঞ্জিনের উৎপাদন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ঘটে থাকে। টেস্টিকলের ভেতরে যেখানে শুক্র উৎপাদিত হয়, রয়েছে প্রায় ৫০০ মিটার লম্বা আণুবীক্ষণিক নল। কোন আধুনিক কারখানায় যেভাবে কনভেয়র-বেল্ট এসেম্বলী সিস্টেম কাজ করে, সেভাবেই এই নলের ভিতরে শুক্র উৎপাদিত হয়। শুক্রাণুর বর্ম, ইঞ্জিন, এবং লেজের অংশ একের পর এক জোড়া লাগানো হয়। ফলশ্রুতিতে যা পাওয়া যায়, তা ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিস্ময়। এই বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে আমাদের একটু চিন্তা করা উচিত।

কিভাবে এই অচেতন কোষগুলো সঠিক আকৃতিতে শুক্রাণু তৈরি করতে পারে মায়ের দেহ সম্পর্কে কিছুই না জেনে?

কিভাবে তারা বর্ম, ইঞ্জিন এবং লেজ তৈরী করা শিখল যা মায়ের দেহে শুক্রাণুর জন্য প্রয়োজনীয়?

কোন বুদ্ধিবলে সঠিক পরম্পরায় তারা এগুলোকে জোড়া লাগায়?

কিভাবে তারা জানে যে শুক্রাণুর ফ্রুকটোজ দরকার হবে? কিভাবে তারা ফ্রুকটোজ চালিত ইঞ্জিন বানাতে শিখল? এ সমস্ত প্রশ্নেরই একটি উত্তর রয়েছে। শুক্রাণু এবং যে তরলের মধ্যে তা স্থাপিত তা বিশেষভাবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মানব জাতির বংশধারা অব্যাহত রাখার জন্য।

শুক্রাণুর গঠনের এই আশ্চর্য পরিকল্পনা নিজেই সৃষ্টির একটি বিস্ময়। বস্তুতঃ আল্লাহ কুরআনে শুক্র ধারণকারী এই তরল সম্পর্কে বিশেষভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন:

"আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে। তাহলে কেন তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস কর না? তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত

সম্পর্কে? তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?" (সূরা আল-ওয়াকিয়া : ৫৭-৫৯)

শুক্রাণুগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা

প্রায় ২৫০ মিলিয়ন শুক্রাণু একই সময়ে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে। এত বিশাল সংখ্যার কারণ হলো গর্ভে প্রবেশের পরই এরা মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়।

মাতৃগর্ভে বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়াকে ধ্বংসের জন্য ঘন এসিডের দ্রবণ থাকে। এই এসিড শুক্রাণুর জন্যও ক্ষতিকর। শুক্রাণু প্রবেশের কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাতৃগর্ভের পৃষ্ঠদেশ মৃত শুক্রাণু দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রায় সমস্ত শুক্রাণুই মারা যায়।

এই এসিড মাতার শরীরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তা এতটাই শক্তিশালী যে, মাতৃগর্ভে প্রবেশ করা সমস্ত শুক্রাণুকেই মেরে ফেলতে পারে। সুতরাং নিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত নাও হতে পারে এবং মানব প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু আল্লাহ, যিনি শুক্রাণুও সৃষ্টি করেছেন তিনি এই বিপদসংকুল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সতর্কতার পথও দেখিয়েছেন।

মানবশরীরে যখন শুক্রাণু উৎপন্ন হয় তখন এর সাথে এক জাতীয় রাসায়নিক উপাদান মিশে যায়। এই রাসায়নিক উপাদান মাতৃগর্ভের এসিডের প্রভাব আংশিকভাবে প্রশমিত করে। আর এর ফলেই কিছু শুক্রাণু মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে শেষ পর্যন্ত ডিম্বনালীতে প্রবেশে সমর্থ হয়।

যদিও সব শুক্রাণুই একই দিকে যায় কিন্তু তারা কিভাবে সঠিক দিকে যেতে পারে? তারা কিভাবে জানল ডিম্বাণুর অবস্থান কোথায়?

একটা ধূলিকণার চেয়েও অনেক অনেক ছোট একটি ডিম্বাণুর অবস্থান বের করা কি সম্ভব?
শুক্রাণু ডিম্বাণুর দিকে সঠিক রাস্তায়ই যায় কেননা এর পেছনে রয়েছে আরেকটি জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অবদান।
যখন শুক্রাণু ডিম্বাণু হতে প্রায় ১৫ সে:মি: দূরে থাকে তখন ডিম্বাণু এক ধরনের রাসায়নিক সংকেত পাঠায়, প্রকৃত পক্ষে এই সংকেতের মাধ্যমে ডিম্বাণু শুক্রাণুকে নিজের দিকে আমন্ত্রণ জানায়, যদিও তারা এর আগে কখনো পরস্পরের সংস্পর্শে আসেনি। এভাবে ২টি সম্পূর্ণ অচেনা কোষ পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ করে। তাই বলা যায়, ডিম্বাণু এবং শুক্রাণুকে কেবলমাত্র পরস্পরের জন্যই তৈরী করা হয়েছে।

আশ্চর্য মিলন

অবশেষে শত শত শুক্রাণু ডিম্বাণুর কাছে পৌঁছায়। কিন্তু তাদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতা এখনও শেষ হয়নি। কেননা কেবলমাত্র একটি শুক্রাণুই ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে পারবে। তই এখানে আরেকটি প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। শুক্রাণুগুলো এখানে একটি বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ বাধার সম্মুখীন হয়।
ডিম্বাণুকে ঘিরে একটি শক্ত প্রতিরোধক আবরণ বিদ্যমান। এই আবরণ ডিম্বাণুর দিকে অগ্রসরমান অপ্রয়োজনীয় অঙ্গাণুগুলোকে মেরে ফেলে। এই আবরণকে ভেদ করাও খুব কঠিন। আর এই বাধাকে অতিক্রম করার জন্য শুক্রাণুগুলোর মধ্যে বিশেষ ব্যবস্থা তৈরী হয়।
শুক্রাণুর মাথায় বর্মের নিচে অনেকগুলো গোপন অস্ত্র অবস্থান নেয়, যা এতক্ষণ পর্যন্ত লুকায়িত ছিল। এগুলো খুব ছোট এবং দ্রবীভূত করার ক্ষমতা সম্পন্ন এনজাইম গ্রন্থি। এই গ্রন্থিগুলো প্রতিরোধক

আবরণকে দ্রবীভূত করে তাতে গর্ত তৈরী করে, যার মধ্যে দিয়ে শুক্রাণু এই আবরণের ভিতরে প্রবেশ করে।

যখন শুক্রাণু আবরণের ভিতরে নড়াচড়া করতে থাকে তখন তার বর্মটি ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং অবশেষে তা খসে পড়ে। এই বর্মটির এভাবে খসে পড়ে যাওয়া নিখুঁতভাবে কার্যরত পরিকল্পনার একটি অংশ। কেননা এর মাধ্যমে দ্বিতীয় ধরনের এনজাইম গ্রন্থির উদ্ভব ঘটে। এই গ্রন্থিগুলো শুক্রাণুকে সর্বশেষ বাধা, ডিম্বাণুর আবরণকে ভেদ করতে সাহায্য করে।

এখন আপনারা ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে গৃহীত ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছেন। শুক্রাণুর বর্মটির রং লাল.... বর্মটি ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে এবং শুক্রাণুটি ডিম্বাণুর আবরণ ভেদ করে এর ভিতরে প্রবেশ করে।

শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের এই নির্ভুল ধারণা এখানেই শেষ হয় না।

শুক্রাণুর ডিম্বাণুতে প্রবেশ করার পরপরই আরেকটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে। এতক্ষণ পর্যন্ত শুক্রাণু তার সাথে বয়ে আসা লেজটিকে হঠাৎ করে পরিত্যাগ করে। এটা প্রয়োজনীয়, কেননা তা না হলে, সর্বদা ঘুর্ণায়মান লেজটি ডিম্বাণুর মধ্যে প্রবেশ করে একে ধ্বংস করে ফেলত।

শুক্রাণুর এই লেজটি পরিত্যাগের ঘটনাটির সাথে একটি রকেটের বায়ুমণ্ডল ত্যাগ করার পর তার তেলের ট্যাংক থেকে বিযুক্ত হওয়ার ঘটনার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। (এক্ষেত্রেও তৈলবাহী ট্যাংকটি তার আর কোন কাজে লাগে না) কিন্তু একটি ক্ষুদ্র শুক্রাণু কিভাবে এই সূক্ষ্ম হিসাব করতে পারে? শুক্রাণুর এই হিসাব করার জন্য তাকে অবশ্যই জানতে হবে যে সে তার ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে এবং এরপর লেজটির আর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু

শুক্রাণু হলো একটি অচেতন জৈবিক অঙ্গাণু যার কোন বুদ্ধিমত্তা নেই এবং যা তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা জানতেও অক্ষম।
স্রষ্টা, যিনি শুক্রাণুকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি এর সাথে এমন একটি সিস্টেম (পদ্ধতি) তৈরি করেছেন যা শুক্রাণুর লেজটিকে যথাসময়ে বিযুক্ত করতে পারে।
এভাবে শুক্রাণু তার লেজ পরিত্যাগ করে, ডিম্বাণুকে ভেদ করে, ক্রোমোজমগুলোকে ডিম্বাণুতে পৌঁছায়। ডিম্বাণুতে জেনেটিক তথ্য পরিবহনের কাজটি এভাবে শেষ হয়। এমনি করে শত শত বিভিন্ন রকমের এবং স্বাধীন ব্যবস্থার সমন্বিত প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ পুরুষের দেহের জেনেটিক তথ্যগুলো ডিম্বাণুতে পৌঁছায়।
তাই আমরা দেখলাম, শুধুমাত্র শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনও একটি নির্ভুল পরিকল্পনা দ্বারাই সম্ভব যেখানে কোন দৈবের সুযোগ নেই। এমনকি মানুষ এই ঘটনা সম্পর্কে অবগত নয়, এই ঘটনাগুলোর প্রত্যেকটি পর্যায়ের বুদ্ধিমত্তা ও পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে এর সাক্ষ্য বহন করে যে মানুষ স্রষ্টার সৃষ্টি।

ভ্রূণ

আপনি একটি ডিম্বাণু দেখতে পাচ্ছেন যেটি এখনও শুক্রাণুর সাথে মিলিত হয়নি। শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর জেনেটিক তথ্য পাশাপাশি রয়েছে।
কিন্তু এখন বিশ্বের সবচাইতে অলৌকিক ঘটনাগুলোর মাঝে একটি ঘটতে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ নতুন একটি মানুষ সৃষ্টিকল্পে দুই সেট জেনেটিক তথ্য এখন এক সাথে মিলিত হতে যাচ্ছে।
এই মিলনের পর উৎপত্তি হলো মানব সন্তানের সর্বপ্রথম কোষ—"জাইগোট"।

অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, এই কোষটির ভেতরেই এখনও জন্ম না নেয়া মানুষটি যাবতীয় তথ্য রয়েছে। অনাগত শিশুটির চোখ, গায়ের রং, চুলের রং, চেহারার গড়ন এবং অনান্য যাবতীয় শারীরিক বৈশিষ্ট্য কেমন হবে, এসব যাবতীয় তথ্য এখানে সাংকেতিক ভাষায় (কোড) লেখা রয়েছে।

শুধু তাই নয়, এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে তার কংকাল, অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ, চর্ম, শিরা-উপশিরা এমন কি এসব শিরায় প্রবহমান রক্তকণিকার গঠন এবং সংখ্যা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য।

একজন মানুষের ৭ বছর বয়সের গড়ন থেকে শুরু করে ৭০ বছরে তার গঠন কিরূপ হবে, এ সব যাবতীয় তথ্যই এই কোষে লিখিত আছে।

নিষিক্তকরণের অব্যবহিত পরেই এই কোষটি একটি আশ্চর্য কাজ করে। এটি বিভক্ত হয় এবং দুটি কোষ উৎপন্ন হয়। এরপর এদুটি পুনরায় বিভক্ত হয়ে চারটি কোষ উৎপন্ন হয়। একটি নতুন মানুষের গঠন এখন শুরু হলো।

কিন্তু কেন কোষগুলো বিভাজনের সিদ্ধান্ত নিল? কেন তারা নতুন একটি মানুষকে গঠনের কাজে হাত দিল? কে এই কোষগুলোকে নতুন মানুষ তৈরীর প্রক্রিয়া শেখালো? এই প্রশ্নগুলো আমাদেরকে অসীম বুদ্ধিমত্তা এবং ক্ষমতার অধিকারী একজন সৃষ্টিকর্তার উপলব্ধিতে নিয়ে আসে। যিনি আমাদেরকে এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর মানুষকে, মানবদেহের কোষগুলোকে এবং এই মানুষটিকে ঘিরে থাকা গোটা মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন।

বর্তমানে আপনি এই ক্রমাগত বিভাজনরত এবং সংখ্যাবৃদ্ধিকারী কোষটির ডিম্বনালীতে ভ্রমণ দেখতে পাচ্ছেন। এই কোষ-সমষ্টিকে "মরুলা" বলা হয়।

এই কোষগুচ্ছের বিভাজন ও সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় এবারে আরেকটি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটবে। কিছু কোষ অন্যান্যদের থেকে ভিন্ন হতে শুরু করে। পুরোনো কোষগুলোকে ঘিরে নতুন কোষগুলো ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাড়তে থাকে। অল্প কিছুক্ষণ পরেই মধ্যবর্তী কোষগুলো মিলে ভ্রুণ অর্থাৎ অনাগত শিশুটির মূল দেহ গঠন করে একে ঘিরে থাকা কোষগুলো মিলে উৎপন্ন হয় প্লাসেন্টা বা গর্ভফুল, যা কিনা এই ভ্রুণের জন্য খাদ্য যোগাবে।

কোষগুলোর গঠনের এই পার্থক্য আসা এবং এদের দুটি দলে ভাগ হয়ে ভ্রুণ ও গর্ভফুল উৎপন্ন করা বিজ্ঞানের জগতে এক অলৌকিক ঘটনা হিসেবে স্বীকৃত। এসবকিছুর পেছনে রয়েছে এক গোপন নির্দেশ, যা এই কোষগুলোকে এ কাজ করতে বাধ্য করে।

নিষিক্তকরণের চারদিন পর বিভাজনরত কোষগুলো এদের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত একটি স্থান অর্থাৎ জরায়ুতে পৌঁছে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন না হতে হলে এর চাই জরায়ুতে আটকে থাকার একটি ব্যবস্থা। কিন্তু সদ্য সৃষ্ট এই ভ্রুণ একই রকমের কোষ দ্বারা তৈরী একটি গোলাকার গুচ্ছ। এতে কোন বিশেষ আংটা বা বাড়তি অংশ নেই যার সাহায্যে এটি জরায়ুর গায়ে লেগে থাকবে।

এ ব্যাপারটিও আগে থেকেই বিবেচনা করা হয়েছে। যখন এই কোষগুলো মাতৃজঠরের দেয়ালে পৌঁছায়, একটি নতুন প্রক্রিয়া চালু হয়।

আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের নিচে ধারণকৃত মায়ের জরায়ুতে সদ্য পৌঁছানো কোষগুচ্ছের দৃশ্য। এই কোষগুচ্ছের বহির্ভাগের কোষগুলো একটি বিশেষ এনজাইম নিঃসৃত করে, যা জরায়ুর দেয়ালকে দ্রবীভূত করে। এভাবে এরা জরায়ুর দেয়ালে শক্তভাবে আটকে থাকে এবং দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না।

একেবারে সঠিক স্থানে অবস্থানকারী এবং প্রয়োজনীয় এনজাইম নিঃসৃতকারী এই কোষগুলোর যথোপযোগী উপস্থিতি আবারও নিখুঁত সৃষ্টিকর্মের মহিমাকে প্রকাশ করে।

এই নিখুঁত সৃষ্টিকে ধন্যবাদ, এই কোষগুচ্ছ জরায়ুর দেয়ালে স্থায়ীভাবে আটকে যায়।

নতুন এই জীবন্ত সৃষ্টিকে, যা জরায়ুতে আটকে থেকে বেড়ে ওঠে, ভ্রুণ বলা হয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার এই সত্যটি কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অলৌকিকতাকে প্রকাশ করে। কুরআনে আল্লাহ মায়ের জরায়ুতে ভ্রুণের এই প্রথম অবস্থানকে বর্ণনা করার জন্য আলাক্ব শব্দটি ব্যবহার করেছেন:

"পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আলাক্ব থেকে। পড় এবং তোমার রব সর্বোচ্চ সম্মানিত।" (সূরা আল আলাক্ব : ১-৩)

আরবীতে 'আলাক্ব' বলতে এমন কিছুকে বোঝায় যা কোন কিছুতে শক্তভাবে আটকে থাকে। এমনকি অন্য জীবের চামড়ায় আটকে থেকে রক্ত শোষণকারী কিছু পরজীবী প্রাণীকে বোঝাতেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

অন্য কথায়, কুরআন, যা কিনা এমন এক সময় নাযিল হয়, যখন মানুষের জীববিজ্ঞানের জ্ঞান খুব সামান্য ছিল, তা মায়ের জরায়ুতে ভ্রুণকে বর্ণনা করার জন্য এমন একটি শব্দ ব্যবহার করেছে, যা এর অবস্থার সবচেয়ে সঠিক চিত্র তুলে ধরে। এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে কুরআন স্রষ্টার বাণী।

মায়ের জরায়ুতে শিশুর গঠন

এই পৃথিবীতে অসংখ্য এককোষী প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে। এরা প্রত্যেকেই বিভাজনের মাধ্যমে হুবহু তাদের মতই বহু সংখ্যক কোষ উৎপন্ন করে।

মাতৃগর্ভে ভ্রুণ এককোষী প্রাণী হিসেবেই জীবন আরম্ভ করে এবং কালক্রমে বহুসংখ্যক প্রতিলিপি তৈরী হয়।

এমতাবস্থায় যদি একটি পদ্ধতির আওতায় এদের নিয়ে আসা না হয় তবে গর্ভের শিশুর সকল কোষ একই হতো এবং ফলশ্রুতিতে আমরা পূর্ণাঙ্গ মানবশিশুর পরিবর্তে একটি বিকৃত জৈব বস্তু পেতাম।

কিন্তু এমনটি ঘটতে পারে না কারণ কোষগুলো সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের মধ্যে আছে।

শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের কয়েক সপ্তাহ পর, এক অদৃশ্য নির্দেশমত কোষগুলো বিভাজিত হয়।

আমরা এখন পরিবর্তনটি লক্ষ করছি যা বিজ্ঞানীদের পরমাশ্চর্যের বিষয়। এসকল কোষ এখন অভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গ, কঙ্কাল ও মস্তিষ্ক তৈরী করবে। এই দুটি ফাঁকা স্থানে মস্তিষ্কের কোষ (Brain Cell) তৈরী হচ্ছে। এটা ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ দ্বারা দেখা মস্তিষ্কের প্রথম বিকাশের ছবি।

এখন মস্তিষ্কের কোষগুলো দ্রুত বিভাজিত হবে। ফলে শিশুটি ১০ বিলিয়ন মস্তিষ্কের কোষের অধিকারী হবে।

এখন আমরা মস্তিষ্কের কোষের গঠনপ্রণালী দেখব। প্রতি মিনিটে ৬ লক্ষ নতুন কোষ মস্তিষ্কের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এভাবে যে প্রতিটি কোষ তৈরী হয় তারা প্রত্যেকেই জানে তারা কোথায় অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এর সাথে কোন কোষটির সম্পর্ক থাকবে। প্রায় অসীম সংখ্যক জায়গা হতে কোষটি কেবল প্রয়োজনীয় ১টি স্থানেই জায়গা নেয়।

মানুষের মস্তিষ্কে প্রায় ১০০ ট্রিলিয়ন সংযোগ আছে। যেহেতু মস্তিষ্কের কোষগুলোর নিজস্ব কোন বুদ্ধিমত্তা নেই তাই এই ১০০ ট্রিলিয়ন সংযোগ ঠিকমত স্থাপন করতে হলে মানুষের মস্তিষ্কের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী কোন সত্তাকে দিক-নির্দেশনা দিতে হবে।

শুধু মস্তিষ্কের কোষই নয়, অন্যান্য সকল কোষই ভ্রূণ হতে বিভাজিত হয়ে যার যার নির্দিষ্ট স্থানে জায়গা দখল করে।

এবং যেখানে সংযোগ স্থাপন করতে হবে ঠিক সেখানেই তারা হাজির হয়।

কে সেই মহান সত্তা, যিনি এসব বুদ্ধিহীন কোষগুলোকে একটা দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনার আওতায় এনেছেন?

মাতৃগর্ভে অবিরতভাবে শিশুর গঠনপ্রক্রিয়া চলতে থাকে। কিছু সংখ্যক কোষ অবিরাম প্রসারিত ও সংকুচিত হতে থাকে। এরকম হাজার হাজার কোষ একত্রিত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের সৃষ্টি হয়। আর সারা জীবন ব্যাপী এই হৃৎপিণ্ডের কম্পন চলতে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা একটি আশ্চর্য ঘটনা দেখব। এই যে কোষগুলো যারা পরস্পর স্বাধীনভাবে অবস্থান করছে, এরা হলো শিরার কোষ। এই কোষগুলো হঠাৎ একটির উপর আরেকটি উপরিপাতিত হয়ে শিরা তৈরী করে।

কিভাবে এই কোষগুলো জানল যে, তাদের শিরা গঠন করতে হবে এবং তারা কিভাবেই তা করল?

এই প্রশ্নের উত্তর আজো বিজ্ঞানীরা দিতে পারে নি।

শিরার কোষগুলো একটি নলাকার পরিবহন ব্যবস্থা তৈরী করে। এই শিরাগুলোর অন্তবর্তী পৃষ্ঠ খুবই মসৃণ যেন তা কোন দক্ষ কারিগরের নিপুণ সৃষ্টি।

এই নিখুঁত সংবহন ব্যবস্থা শীঘ্রই শিশুর শরীরের প্রতি অংশে রক্ত বহন করতে শুরু করবে। সংবহন ব্যবস্থার দৈর্ঘ্য ৪০,০০০ কিলোমিটার। তা প্রায় পৃথিবীর পরিধির দৈর্ঘ্যের সমান।

মাতৃগর্ভে শিশুর ক্রমবিকাশ অবিরাম চলতে থাকে। পঞ্চম সপ্তাহে হাত ও পা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

এই স্ফীতি পরে বাহুতে পরিণত হয়। কিছু কোষ হাতে পরিণত হওয়া আরম্ভ করে।

কিছুক্ষণের মধ্যে, এদের কিছু কোষ একটা অত্যন্ত বিস্ময়কর কাজ করে। এদের হাজার হাজার কোষ গণ আত্মহত্যা করে।

কেন এই কোষগুলো নিজেদের হত্যা করে?

মরণাপন্ন কোষগুলো একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। এই কোষগুলো একটি নির্দিষ্ট রেখা বরাবর মারা যায়, এদের দেহ আঙুল গঠনের জন্য প্রয়োজন। অবশিষ্ট কোষগুলো মৃত কোষগুলোকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করে। এবং এই অঞ্চলে ফাঁকা স্থান উদ্ভূত হয়। এই শূন্য স্থান হল আঙুলগুলোর মাঝখানের ফাঁকা স্থান।

কিন্তু এই কোষগুলো কেন এই ত্যাগ স্বীকার করে? কিন্তু কেন এমন হয় যে কোন কোষ নিজেকে হত্যা করতে পারে যাতে শিশুর আঙ্গুল যথাসময়ে গঠিত হয়?

কোষ কিভাবে জানে যে তার মৃত্যু এই উদ্দেশ্য সাধন করবে?

এ সব কিছুই আরও একবার এ কথাই নির্দেশ করে যে কোষগুলো, যা মানবদেহ গঠন করে তা আল্লাহ্‌র নির্দেশ চালিত হয়।

এই সময়, কিছু কোষ পা তৈরি করতে শুরু করে।

কোষগুলো জানে না যে শিশুকে বাইরের পৃথিবীতে হেঁটে বেড়াতে হবে। তবুও তারা পা ও পায়ের পাতা তৈরী করে।

আপনি এখন দেখছেন চার-সপ্তাহের বয়সের একটি মানব শিশুর মুখ।
এই পর্যায়ে দুটো গর্ত গঠিত হয়, ভ্রুণের মাথার পাশে একটা করে গর্ত। বিশ্বাস করা কঠিন, তবে এই গর্তদ্বয়ে চোখ গঠিত হবে।
চোখ গঠন শুরু হয় ষষ্ঠ সপ্তাহে।
এই কোষগুলো অবিশ্বাস্য এক পরিকল্পনায় মাসের পর মাস কাজ করে, এবং একটা একটা করে চোখের বিভিন্ন অঞ্চল গঠন করে।
কিছু কোষ কর্ণিয়া গঠন করে, কিছু কোষ চোখের মণি এবং অন্যরা লেন্স গঠন করে। প্রতিটি কোষ, তাকে যে অঞ্চল তৈরি করতে হবে, সে অঞ্চলের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে থেমে যায়। এবং চোখ, যা ৪০টি ভিন্ন ভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত, তা নিখুঁতভাবে গঠিত হয়।
এইভাবে মাতৃগর্ভে 'অস্তিত্বহীনতা' থেকে চোখ অস্তিত্বে আসে। যে চোখ পৃথিবীর সবচেয়ে নিখুঁত ক্যামেরা হিসেবে স্বীকৃত। আগে থেকেই ভেবে রাখা হয়েছে যে ব্যক্তি জন্মাবে সে তার এই চোখ খুলবে রঙিন এক পৃথিবীতে, এবং চোখ এমনভাবে তৈরী হয়েছে যা এই রঙ অনুভব করার জন্য যথাযথভাবে উপযোগী।
তখন পর্যন্ত অনাগত শিশু যে শব্দ শুনবে এবং সংগীত উপভোগ করবে তাও বিবেচনায় আনতে হবে। সংগীত শোনার জন্য কর্ণ গঠিত হয় মাতৃগর্ভে। এই কোষগুলো পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান সবচাইতে সূক্ষ্ম শব্দ-গ্রাহক যন্ত্র তৈরী করে।
এইসব দৃশ্য আমাদের আবারও মনে করিয়ে দেয় যে, দৃষ্টি ও শ্রবণ আমাদের উপর প্রদত্ত আল্লাহর মহান অনুগ্রহ। আল্লাহ কুরআনে তা এভাবে উল্লেখ করেন,
"আল্লাহ তোমাদেরকে মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর।" (সূরা আন নাহল, ৭৮)

কুরআনের অলৌকিকত্ব

এতক্ষণ আমরা মায়ের জরায়ুতে ভ্রুণের বৃদ্ধি ও গঠন সংক্রান্ত যে সব তথ্য উপস্থাপন করেছি, এসবই গত ৩০-৪০ বছরের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফসল। এবং এই সদ্য আবিষ্কৃত তথ্য কুরআনের আরও নতুন নতুন অলৌকিকত্বকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে।

অল্প কিছুদিন আগেও ধারণা করা হত যে হাড় ও পেশী একই সাথে গঠিত হয়। কিন্তু সদ্য গবেষণার ফলে এমনকিছু নতুন বিষয় জানা গেছে, যা সম্পর্কে মানুষ অনবহিত ছিল। তা হচ্ছে, প্রথমে ভ্রুণের হাড়ের কোষগুলো গঠিত হয়। এবং তার পরবর্তীতে হাড়ের চতুর্দিকে পেশীকোষ তৈরী হতে শুরু করে।

মজার ব্যাপার হলো, কুরআন এই সদ্য আহরণকৃত জ্ঞান ১৪০০ বছর পূর্বে বিধৃত করেছে:

"এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়! (সূরা মুমিনুন : ১৪)

অপরপক্ষে, জন্মসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে, যে মায়ের জরায়ুতে শিশু তিনটি পর্যায়ের ভিতর দিয়ে যায়। এ বিষয়টি ভ্রুণবিদ্যার পাঠ্য বই "Basic Human Embryology" তে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

"জরায়ুতে জীবন তিনটি পর্যায়ে অতিক্রম করে: প্রাক-ভ্রূণীয় পর্যায় (প্রথম ২.৫ সপ্তাহ), ভ্রুণীয় পর্যায় (অষ্টম সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত), ফীটাল পর্যায় (অষ্টম সপ্তাহ থেকে জন্ম পর্যন্ত)।"

বহু বছরের গবেষণা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের যে তথ্য আজ জানা গিয়েছে, কুরআন ১৪০০ বছর পূর্বেই তা জানিয়ে দিয়েছে। মায়ের জরায়ুতে শিশুর এই তিনটি পর্যায় কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে:

"তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে। তিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা, সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমার কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ?" (সূরা আয যুমার : ৬)

প্লাসেন্টা বা গর্ভফুল

পর্দায় আপনি যে যন্ত্রটি দেখতে পাচ্ছেন, তা হচ্ছে বিশ্বের সর্বচেয়ে উন্নত প্রযুক্তির ডাক্তারী যন্ত্র। এটি এমন একটি জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র যা intensive care এ থাকা রোগীর জন্য ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু এই ঘরভর্তি উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রটির তুলনায় আরও উন্নত জৈব প্রযুক্তি রয়েছে যার কাছে এটি কিছুই নয়।

যন্ত্রটি হচ্ছে গর্ভফুল, যা মাতৃগর্ভে ভ্রুণকে ঘিরে থাকে এবং এর সব চাহিদা পূরণ করে।

গর্ভফুল একই সাথে কিডনী ডায়ালাইসিস যন্ত্র, হার্ট-লাঙ যন্ত্র এবং কৃত্রিম যকৃত হিসেবে কাজ করে। একই সময়ে এটি এই সবগুলো কাজ করে। এই অপূর্ব কারুকাজ মা ও শিশুকে বাঁচিয়ে রাখে।

গর্ভফুলটি যে কোষ দ্বারা গঠিত সেই কোষগুলো মায়ের রক্তের মিলিয়নের অধিক অণু হতে খাদ্যকণা চিনে বের করে এবং শিশুকে তা পৌঁছে দেয়।

গর্ভফুলের আরেকটি কাজ হচ্ছে ভ্রুণকে রক্ষা করা।

মাতৃদেহের রক্ষী কোষসমূহ জরায়ুর দিকে অগ্রসর হয় এবং বর্ধমান ভ্রুণকে আক্রমণের চেষ্টা করে। কিন্তু গর্ভফুলের

বহিঃস্তরের ঝিল্লী মাতৃশিরা এবং ভ্রূণের মাঝে বিশেষ ধরনের ফিল্টার হিসেবে কাজ করে। ঝিল্লীটি শুধুমাত্র পুষ্টি কণাসমূহ যেতে দেয় কিন্তু রক্ষীকোষগুলোকে যেতে দেয় না।

যদি কোন মানুষকে বাড়ন্ত ভ্রুণের পরিচর্যার ভার দেয়া হতো তবে এক মিনিটের বেশি এই ভ্রুণকে বাঁচানো সম্ভব হতো না। কেননা মানুষের মাঝে সেই প্রযুক্তি নেই যার দ্বারা সে ভ্রুণের পরিবর্তনশীল চাহিদা হিসেব করে পূরণ করতে পারে। গর্ভফুলই হচ্ছে একমাত্র ব্যবস্থা যা এই কাজের জন্য উপযুক্ত।

এই নালী শিশু ও মায়ের মধ্যেকার সংযোগ গঠন সম্পন্ন করে।

এই নালী যা জন্মের পর কেটে ফেলে দেয়া হয় তা প্রযুক্তির এক সত্যিকারের বিস্ময়। এটি নয় মাস ধরে জীবনের জন্য অপরিহার্য কাজ করে। এটি একটি শিরা ও দুটি ধমনী ধারণ করে।

এই শিরা ভ্রুণে খাদ্য ও অক্সিজেন বহন করে। এই ভ্রুণ তরল-পূর্ণ আবহাওয়ায় সম্পূর্ণ ডুবে থাকার এবং ফুসফুস পানিপূর্ণ থাকার পরও ডুবে মরে না। যদিও এর পরিপাকতন্ত্র গঠিত হয়নি এবং এটি খেতে পারে না, তবু এটি মারা যায় না। এই দুটো মৌলিক প্রয়োজনের উভয়ই গর্ভফুলের মধ্যে দিয়ে ভ্রুণে সরবরাহ করা হয়। ধমনীগুলো কার্বন ডাই অক্সাইড এবং খাদ্যের বর্জ্য শিশুর শরীর থেকে অপসারণ করে।

মা ও তার গর্ভে বাড়ন্ত শিশু এদের কেউই এই সব ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত নয়।

জন্ম

যতই দিন যায় জরায়ুতে শিশুটি বাড়তে বাড়তে নির্দিষ্ট আকৃতি লাভ করতে থাকে। শিশুটি পৃথিবীতে আসার উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

এবার সময় এসেছে সর্বশেষ ধাপটির—জন্ম।

কিন্তু জরায়ুতে অবস্থানরত শিশুকে ঘিরে রয়েছে নানা বিপদ। শিশুটিকে জন্মের সময় জরায়ু এবং শ্রোণীহাড়ের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। এটা তার জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। জন্মের সময় শিশুটির মাথা এসকল সরু এলাকা দিয়ে অগ্রসর হবার সময় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে এবং শিশুটির মাথার খুলি প্রচণ্ড চাপের সম্মুখীন হতে পারে।

কিন্তু, এবারও বিশেষ ব্যবস্থায় শিশুটি রক্ষা পায়।

নবজাতকের খুলির হাড় হয়ে থাকে খুবই নরম এবং এগুলো পূর্ণবয়স্ক মানুষের খুলির ন্যায় পরস্পরের সাথে দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে না। জন্মের সময় এ হাড়গুলো পরস্পরের ওপর দিয়ে স্লাইড করতে পারে। হাড়ের মাঝের এসকল শূন্যস্থানের দরুণ শিশুটির মাথাটি রক্ষা পায়।

এইভাবে শিশুটি সুস্থভাবে বেড়ে ওঠে এবং তার খুলি ও মস্তিষ্ক থাকে সুরক্ষিত।

পরবর্তী মাসগুলোতে খুলিটি ধীরে ধীরে সুগঠিত হতে থাকে।

এই ফিল্মে ধাপে ধাপে যেসকল অগ্রগতি দেখানো হলো, তা বিশ্বের প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই ঘটেছে। প্রত্যেকেই শুক্রাণুর সাথে যুক্ত ডিম্বাণু হিসেবেই জরায়ুর দিকে অগ্রসর হয়। (সে সময়কার যথোপযুক্ত পরিবেশের জন্য ধন্যবাদ।) এরপর জীবন শুরু হয় একক কোষ হিসেবে। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে যখন মানুষের বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিলনা তখন সৃষ্টিকর্তাই তাকে আকৃতি প্রদান করেন এবং একটি মাত্র কোষ থেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করেন।

এসত্যটি স্বীকার করা বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

আর আপনি কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা জানবার পর আপনার দায়িত্ব সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, যিনি একবার আমাদের সৃষ্টি করেছেন, মৃত্যুর পর তিনি আমাদের আবার জীবিত করবেন আমাদের প্রতি তাঁর করুণার ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য। এটা তাঁর জন্য খুবই সহজ।

যারা নিজের জন্মকে ভুলে যায় এবং পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করে সে বিভ্রান্ত।

এদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

"মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে? অতঃপর তখনই সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডাকারী। সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচে গলে যাবে? বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত।" (সূরা ইয়াসীন : ৭৭-৭৯)